ক্রেগ ভেন্টারের গবেষণা — প্রাণের সৃষ্টির আর কতদূর?

ড. সুরজিৎ সিন্‌হা

পরশুরামের গল্পে গুরুদেব জটিরামের সঙ্গে পঞ্চীর ধড় আর মুণ্ডু অদলবদল করে দিলেন। ফলে, দুটি সম্পূর্ণ নতুন প্রাণীর আবির্ভাব হলো। নিজের বড় আর অন্যের মুণ্ডু দিয়ে যারা তৈরি হলো, তারা কি সিন্‌থেটিক প্রাণী?

ক্রেগ ভেন্টার নামের এক বিজ্ঞানী স্যান্দিয়েগোর ভেন্টার ইন্‌সইটট্যুটে সম্প্রতি মাইক্রোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকোলাম নামের একটি ব্যাকটিরিয়ার কোষে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ল্যাবরেটারিতে তৈরি এই মাইক্রোপ্লাজমা মাইকয়েডসের জেনোম। অতঃপর কিমাশ্চর্য! নতুন তৈরি ব্যাকটিরিয়াটি ধীরে দীরে ল্যাবরেটরীকৃত জেনোমের চরিত্রগত সব রকমের বৈশিষ্ট্যই দেখাতে থাকে। অর্থাৎ সেটি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাইক্রোপ্লাজমা মাইকয়েড্‌স ব্যাকটিরিয়া। ভেন্টার বলেছেন এটি সিনথেটিক—কৃত্রিম উপাদানসৃষ্টি!

আসলে জীবনের উপাদান নিয়ে মানুষের কৌতূহল তো চিরদিনের। সৃষ্টির আদিতেই কি প্রাণ ছিলো? নিদেনপক্ষে প্রাণের উপাদান? প্রশ্ন করেছে মানুষ, উত্তর খুঁজেছেন বিজ্ঞানীরা।

এবং উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, জীবনের উপাদান তিনটি। শক্তি, জল এবং কিছু রাসায়নিক কাঁচামাল। এই কাঁচামালগুলো কী কী? হাইড্রোজেন, কার্বণ মেনোক্রাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং মিথেন। আর শক্তি? সৌরশক্তি তো আমরা সবাই জানি। এছাড়া প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তিগুলোর উৎস হলো বিদুৎ এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাত। সৃষ্টির আদিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া কেমন ছিলো সে তো কারোরই জানা নেই। কিন্তু দেখা গেছে একটা ফ্ল্যাক্সে জল এবং উল্লিখিত রাসায়নিক কাঁচামালগুলো একসাথে রেখে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎচালনা করলে কিছু কিছু জৈব অণু এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। পঞ্চাশের দশকে স্ট্যানলি মিলার একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই পরে তৈরি হয়েছে প্রোটিন এনডাইন। বস্তুত স্ট্যানলি মিলারের পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে শুধু প্রোটিন এনডাইনই নয়, —জল, রাসায়নিক কাঁচামাল এবং শক্তির বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে আরো অনেক জটিল জৈব অণু, যেগুলো জীবনের উপাদান হিসেবে বোধহয় কাজে লেগেছে এক সময়।

একথা এখন প্রায় সবাই জানেন যে জীবনের মূলে প্রোটিন এনজাইমের সঙ্গে আছে ডি-এন-এ এবং আর -এ অণু। আর এগুলোই জীবকোষের সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা — যাঁদের মধ্যে লেসলি অর্জেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য — দেখিয়েছেন, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কীভাবে তৈরি হয় নিউক্লিইক অ্যাসিড, যা হলো আর-এন-এ এবং ডি-এন-এ-র উপাদান। এই ডি-এন-এ এবং আর-এন-এন প্রায় স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ একবার তৈরি হয়ে গেলে এরা নিজেরাই নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জীবনের শুরুতে প্রথমে তৈরি হয়েছিলো আর-এনঃএ এবং বিবর্তনের ধাপে ধপে এই আর-এন-এ থেকেই তৈরি হয়েছে ডি-এন-এ অনু। ডি-এন-এ কে বলা হয় বংশবৃদ্ধির ধারক এবং বাহক। আর ডি-এন-এ-ই জীবনের বাকি সব উপাদান—অর্থাৎ প্রোটিন, এনজাইম, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং হরমোন তৈরি করে। ফলে, বিজ্ঞানের ভাষায়, এরাই হলো কোষের উপাদান। আর কোষ হলে তো হয়েই গেলো। কারণ প্রাণীর শরীর এবং তার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোষ থেকেই তো তৈরি হয়।

তাহলে দেখা গেলো, ডিঃএনঃএ-ই সেই সর্বশক্তিমান উপাদান যা জীবের চেহারা-ছবি, চলন-বলন এমনকি ভাবনা-চিন্তাও নিয়ন্ত্রণ করে। তা-ই যদি হয়, তাহলে আবার আর-এন-এ কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমেই খাড়া করলেন একটি হাইপথিসিস, যাকে বলা হলো আ-এন-এ ওয়ার্লড হাইপথিসিস। এতে বলা হলো, প্রাণস্পন্দনের (সব প্রাণীর, এমনকি উদ্ভিদ-শ্যাওলা-ছত্রাক জাতীয় প্রাণীরও) শুরুতে ডি-এন-এ ছিলোই না, ছিলো শুধু আর-এনঃএ। এই হাইপথিসিসের যাথার্থ্য পরে কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক টি. আর. চেক প্রমাণ করে বললেন, বংশগতি বা কোষ সংশ্লেষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের অনুষটকের কাজ, সৃষ্টির শুরুতে করতো আর-এনঃএ-ই। ডারউইন যাকে বলেছেন বিবর্তনবাদ, তারই নিয়মে শেষ পর্যন্ত আর-এনঃএ-ই তৈরি করলো আরও বেশি কার্যক্ষম ডি-এনঃএ এবং প্রোটিন এনডাইন। এই ডি-এন-এ-ই জীনের প্রাণ। প্রাণীর চরিত্রের মূল রহস্যটি, এখন বোঝাই গেছে, রয়েছে এই ডি-এন-এ-র মধ্যেই।

তাহলে কি জীন, অর্থাৎ ডি-এন-এ, তৈরি করতে পারলেই প্রাণ সৃষ্টির মতো একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া যাবে? ল্যাবরেটারীতে ডি-এন-এ তো তৈরি হচ্ছে অনেকদিন ধরেই। সংশ্লেষ জীববিদ্যা বা সিনথেটিক বায়োলজি নামে বিজ্ঞানের যে অত্যাধুনিক শাখাটি এখন পৃথিবী কাঁপানো কাজ করে চলেছে, করেই চলেছে একটার পর একটা—তা তো বিজ্ঞানীকে শিখিয়েইছে কী করে কোন একটি প্রাণীর কোন কোন কোষে কিছু কিছু ডি-এন-এ ছেঁটে ফেলে তার বদলে ল্যাবরেটরিতে তৈরি পছন্দসই ডি-এন-এ ঢুকিয়ে দিলে, প্রাণীটির চরিত্রে পছন্দমাফিক বদল ঘটিয়ে দেওয়া যায়। স্কুল কলেজে— এমনকি স্নাতক স্তরেও —আজকাল বায়োটেকনোলজির যে পাঠ দেওয়া হচ্ছে, তা শিখে এ ধরনের প্রযুক্তির কাজ তো কতই হচ্ছে। ফলে আমরা পাচ্ছি ঈস্ট্‌ থেকে তৈরি ''হিউম্যান'' ইনসুলিন অথবা বীজহীন আঙুরের মতো মনোহরণ খাদ্য। কিন্তু প্রাণ? ডি-এন-এ তৈরি করে কি প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব?

এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে ডি-এন-এর দিকে আরেকবার চোখ ফেরানো যাক্। এই অণুটাকে দেখতে কেমন? খানিকটা যেন প্যাঁচানো দড়ির মতো। অণুটা ঐ দড়ির মতই লম্বাটে। দড়িটা কী দিয়ে তৈরি? চারটি প্রাথমিক রাসায়নিক উপাদান— যাদের নাম হলো অ্যাডনিন (A), থায়মিন (T), সাইটোসিন (C), আর গুয়ানি (G)। ঐ যে বললাম পাঁচানো দড়ি, এর মানে হলো, দড়িটা আসলে একটামাত্র দড়ি নয়। দুটো সমান্তরাল দড়ি, একই উপাদানে তৈরি, যাদের মতো প্যাঁচানো দড়ির মতোই পাক। এই যে পাক, এই পাক একটি দড়ির কোনো একটি উপাদানের সঙ্গে আর একটি দড়ির অন্য একটি উপাদানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। এই সম্পর্কের একটি নিয়মের কথা না বললে চলবে না। এই সম্পর্ক, জোড় — বা বন্ডিং — হয় দড়ি দুটির রাসায়নিক উপাদানের দুটি জোড়ার মধ্যে। একটি জোড় অ্যাডনিন ও থায়মিনের এবং অপরটি সাইটোসিন ও গুয়ানিনের। এই জোড়ের নিয়মটি দ্বিতন্ত্রী, অর্থাৎ ডাবল্ হেলিক্সের তত্ত্বের নিয়ম মানা। আর জোড়গুলির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন বেস পেয়ার, অর্থাৎ দুটি প্রাথমিক উপাদানের জোড়।

কিন্তু প্রশ্নটা হলো, উপাদান চারটি কী নিয়মে দড়ি দুটিতে থাকবে? বস্তুত এরও কোন নিয়ম নেই। এরা প্রায় নিজেদের ইচ্ছেমাফিকই — যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন র‍্যান্ডম অর্ডারে — নিজেদের অবস্থানের একটা প্যাটার্ন তৈরি করে। মজার কথা হলো, যতই র‍্যান্ডম হোক, একবার অবস্থানের নিয়ম তৈরি হলে প্রতিটি প্রাণীর ডি-এন-এ-ই তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। তাই তো একটি প্রাণী একটিই — একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এখন ফেরা যাক ল্যাবরেটরীতে। প্রাণ সৃষ্টির আগেও প্রশ্নটা ডি-এনঃএ-র সংশ্লেষ বা সিনথেটিক ডি-এন-এ সৃষ্টির। ডি-এন-এ দড়ির গঠঠনটির কথা মনে রাখলে বোঝা যায় কাজটা কতটা কঠিন। ১৯৮৪ সাস পর্যন্ত মাত্র তিনশোটি বেস পেয়ারের ডি-এন-এ তৈরি সম্ভব হয়েছে। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি-এন-এ দিয়ে তো আর জীবকোষ তৈরি করা যায় না, সেখানে প্রয়োজন অযুতসংখ্যক বেশ পেয়ারের। ক্রেগ ভেন্টার এবং তাঁর সহযোগীরা মিলে ল্যাবরেটরীতে তৈরি করলেন দশ লক্ষ আট হাজার বেস পেয়ারের ডি-এন-এ বা জেনোম। এর বড় বেস পেয়ারের ডি-এন-এ একটা বিপ্লব তো বটেই। কিন্তু প্রাণী সৃষ্টি যাঁর লক্ষ্য, সে বিজ্ঞানীর উচ্চাশার কাছে একটা বস্তুত ক্ষুদ্র—আপাতক্ষুদ্র —একটি পদক্ষেপ মাত্র (আপাতক্ষুদ্র বললাম এই জন্যে যে, এর প্রভাব হতে পারে প্রায় বিস্ফোরক!)। এই জেনোম তৈরির করা হলো মাইক্রোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকোলামের একটি কোষ থেকে সাবধানে ছেঁটে ফেললেন তার পুরো জেনোমটাই। অর্থাৎ এখন তাঁর এক হাতে ক্যাপ্রিকোলাম কোষের একটি খোল, অন্য হাতে মাইকয়েড্স-এর জেনোম। এবার প্রায় ঐন্দ্রজালিকের কায়দায়, যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে, ঐ ফাঁকা খোলে ঢুকিয়ে দিলেন ল্যাব-এ তৈরি মাইকয়েড্স-এর ডেনোমটি। অতঃপর? হ্যাঁ, স্বয়ম্ভু জেনোমটির বিভাজন শুরু। এবং কয়েকটি বিভাজনের পর আমরা পেয়ে গেলাম নতুন তৈরি, মাইকয়েড্সের চরিত্র সম্পূর্ণ মেনে-চলা, একটি জীবন্ত মাইক্রোপ্লাজমা মাইকয়েড্সের কোষ! এ যেন, দু-একটি জীনের অদলবদল ঘটিয়ে আমের আঁটিটি ছোট করে ফেলা নয়, ঐন্দ্রজালিকের কায়দায় একটা আপেলকে একেবারে আম বানিয়ে ফেলা! ছিলো রুমাল, হয়ে গেলো একটা আস্ত বেড়াল? উঁহু, ছিলো ইঁদুর, হয়ে গেলো একটা আস্ত বেড়াল!

তাই কি? অর্থাৎ ল্যাবরেটরীতে সম্পূর্ণ জীবসৃষ্টির চাবিকাঠিটি এসে গেলো আমাদের হাতের মুঠোয়? বোধ হয় না, কারণ মনে রাখতে হবে, প্রথমত, আপেলটির দরকার ছিলো আম তৈরিতে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিথেটিক নয়। দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নেওয়া যায়, যত ছোটই হোক্, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই কোষটি সিন্থেটিক-ই, তবুও, এও তো ঠিক যে, এই কোষটি জীবনের একেবারে আদিপর্বের। এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে জীবজগৎ তৈরি করতে প্রকৃতির লেগেছিলো চারশো কোটি বছর, অজস্র উথাল-পাথাল-সৃষ্টি-ধ্বংসের আবর্ত-আর ডারউইন কথিত বিবর্তনের ভাঙা গড়া—পেরিয়ে।

কিন্তু তবুও ভেন্টারের এই কাজ মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে এক বিশাল পদক্ষেপ। নতুন এই ব্যাকিটিরিয়াটির জন্মলগ্নে লেখা রইলো দুটি কোষের সংহতির ইতিহাস। এই রকম কত না অণু এবং জৈব অণুর সংহতি, ভাঙা - গড়া, জোড়া - খোলা যে ঘটেছে প্রথম জীবের জন্মলগ্নে, তার জীবন্ত ছবিটিও আমাদের দেখিয়ে দিলেন ভেন্টার।

জীবসৃষ্টির এই প্রথম পদক্ষেপটি শেষ পর্যন্ত আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, এ নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীদের তর্ক-উত্তেজনা তো চলবেই। কিন্তু অচিরেই এর কিছু কিছু সুফল যে আমরা দেখতে পাব, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ভেবে দেখুন তো, অন্য ব্যাকটিরিয়ার খোলে মিথেন -সংশ্লেষ -পটু ব্যাকটিরিয়ার জেনোমের উপস্থাপন আমাদের জ্বালানী সমস্যার কী সুদূরপ্রসারী সমাধান করতে পারে। অথবা রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়ার খোলে স্বাস্থ্য উদ্দীপক ব্যাকটিরিয়ার উপস্থাপন মানুষের জীবনকে বদলে দিতে পারে কতটা।

আর জ্ঞানপিপাসু দশদিশির পাঠকও হয়তো নতুন নতুন জ্ঞান এবং চিন্তার খোরাক পাবেন কতই না। ধরুণ অধুনালুপ্ত কোন প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিলের ডি-এন-এ বিশ্লেষণ করে, ঠিক সেরকম ডি-এন-এ তৈরি করা হলো ল্যাবরেটরীতে। তারপর সেই ডি-এন-এ এখনকার কোন ব্যাকটিরিয়ার খোলে ঢুকিয়ে পাওয়া গেলো প্রাগৈতিহাসিক কোন জেনোম। কল্পনা করা যেতেই পারে, নতুন তৈরি জেনোমটির চরিত্র এবং আচার ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণের জেনোমটির মতই হবে। আর দশদিশির ভাগ্যবান পাঠক পেয়ে যাবেন প্রাগৈতিহাসিক জীবনের শুলুক-সন্ধান, হাতে গরম।